নবম অধ্যায়

সাধকের পথে বাধাবিঘ্ন

প্রথম প্রথম এক সময় সাধকের এক ভাব হয়। ছোট বড়, যে কেহ প্রণাম করিতে আসিলে, মনে হয় কেন আমাকে প্রণাম করিবে। আমি অতি দীন, কিছুই না। সেইজন্য সে প্রণাম করিতে দিতে পারে না। সরিয়া যায়। আরও একটা ভাব হয় — শক্তিক্ষয় হইবে। যখন ক্রমশঃ কিছু শক্তিলাভ হয়, কাহারো আর একটা ভাব জাগিবার আশঙ্কা থাকিতে পারে। তখন ভিতরে ভিতরে সর্ব-সাধারণের মঙ্গল করিবার ভাব জাগে। কেহ নমস্কার করিলে আশীর্বাদ করে বা কেহ কিছু ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করে। যেমন নির্ধনীরা ধন লাভ করিয়া অনেক সময় লোককে খাওয়াইয়া পরাইয়া দান করিয়া আনন্দ লাভের বাসনা জাগে। সে অবস্থায় লোকের সহিত তাহার সৎ ব্যবহার, ক্ষমা, দয়া ইত্যাদি প্রকাশ পায় এবং সে আনন্দ পায়, সত্য বস্তু কিনা! সে সকলকে দিতে ও জানাইতে চায়। তাহার ভিতর কিছু সঞ্চিত আছে বলিয়া শ্রোতারা তাহার কথায় প্রাণে আনন্দ পায়। এইরূপ ব্যক্তির লক্ষণাদি কতকটা মধুর দেখায়। সম ব্যবহার ও সরল খোলা ভাব, তাহাতে দেখা যায়। হিংসা, মিথ্যা বা নিন্দা, তাহার নিকট বিশেষভাবে আশ্রয় পায় না। সে লোভ মোহাদি হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। সত্যনিষ্ঠা নিয়া আরো উন্নতি করিলে কোন কোন সময় তাহার সামান্য সামান্য বিভূতিও দেখা যায়। ঐ সব প্রথমতঃ শরীর ও বিষয় জনিত ব্যবস্থাদি নিয়া বাহিরে প্রকাশ হয়। তখনো ভিতরে লুক্কায়িত প্রশংসা, প্রতিষ্ঠার ভাব থাকে বলিয়া সেই রসবোধে কাহারো কিছু সুবিধা করিয়া দিয়া আনন্দ পাওয়া বা কাহারো নিকট হইতে ধর্মার্থ কোন বিষয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। প্রতিষ্ঠার জন্যও এইসব ভাবের মূলোচ্ছেদ হয় না। এই অবস্থায় বিশেষ মাতিয়া গেলে শক্তি ক্ষয় অনিবার্য। ইহার কারণ এই যে, সত্য বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যে শক্তি লাভ করিয়াছে, সে যদি এই সব বাহিরের খেলায় অধিকতর মাত্রায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে

তাহা হইলে কোন সময় যে, তাহাকে সত্য পথ হইতে বিপথগামী করিয়া সত্য মিথ্যায় জড়াইয়া ফেলে। সে প্রথমতঃ টের নাও পাইতে পারে। পরে যখন বুঝিতে পারে, তখন মহা দুঃখের কারণ হয়। ঐ সময় যথাশক্তি হুঁসিয়ার থাকা ও ঐ গন্তব্যে লক্ষ্য রাখা। সাধক সামান্য সামান্য বিভূতিতে আকৃষ্ট না হইয়া যদি সাধনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দেয়, লক্ষ্যপতির এক লক্ষ্যে চলে, তাহা হইলে যতই অগ্রসর হয়, ততই তাহার ভিতর নানা প্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতির খেলা খুলিতে থাকে। আধ্যাত্মিক খেলা এই যে, আধ্যাত্মিক ভাবের কথা ছাড়া অন্য কোন বিষয় তাহার ভাল লাগে না, বাজে কথা কানে শুনিলে, বাজে বিষয় চোখে দেখিলে, তাহার গায়ে কাঁটা বা আগুন লাগার মত জ্বালা যন্ত্রণা হয়। সকল সময় ভগবৎ কথা ছাড়া অন্য কথা বলিতেও তাহার ভাল লাগে না। সর্বক্ষণ আধ্যাত্মিক ভাবে সংলগ্ন থাকার দরুণ তাহার হাবভাবগুলি বড় সুন্দর দেখায়। তাহাতে যৌগিক নানাপ্রকার অলৌকিক বিভূতিকে, যাহার যাহার সাধনার গতি অনুযায়ী তাহার সেইরূপ প্রকাশটি দেখা যায়। ঐ সব বিভূতিকে যাহারা সরাইয়া চলিতে না পারে তাহারা আবার সে খেলার ভিতরই আটকাইয়া যায়। আর যাহারা সেইগুলিও অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা একযোগে উচ্চতম স্তরে আরোহণ করে। ক্রমে ক্রমে সে আরো যখন অগ্রসর হয়, তখন তাহার বলা কওয়ার ভাবগুলি কমিয়া আসে। সে দেখে এই উচ্চভাবের কথা বিনাকর্মে ও গুরু-কৃপা ছাড়া কেহ বুঝিতে পারিবে না, তবুও প্রকৃত জিজ্ঞাসুকে সে সরল ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করে। আর প্রণাম বা স্পর্শ তাহাকে কেহ করিতে গেলে সে বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠে এবং তাহার পক্ষে অসহনীয় হয়। কারণ চুলার উপর তপ্ত পাত্রে জল কিংবা জলসংযুক্ত কিছু দিলে যেমন ছ্যাঁক করিয়া উঠে, ঠিক সেই অবস্থা তাহার হয়। নমস্কারকারীর বাসনা কামনা রূপ যে ভাব তাহা তাহাকে আঘাত করে।

পরে যদি সাধক দৈহিক খেলার পরপারে যায়, তখন আর তাহাকে এইসব বিষয় চঞ্চল করিতে পারে না। স্বভাবে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কোন ভাব হইতে অব্যাহতি নাই। মোটামুটি কয়েকটি অবস্থা বলা হইল। অবশ্য জগৎগুরু যিনি, তাঁহার যে করুণার ধারা সে ভিন্ন কথা।

এইসব কথা শুনিয়া প্রশ্ন উঠিল সাধকের কথা ত শুনিলাম। আপনার প্রণামে এইরূপ কেন? মা বলিলেন — আরে! এই শরীরের কথা বাদ দে। এই শরীর ত তোমাদের এক একটা নিয়া আপন খেয়ালে সাময়িক খেলিয়া যাইতেছে। দেখিতেছ না। সবটাই ত এইরূপে।

এ মহাযাত্রায় বিশেষ বিঘ্নেরও আশঙ্কা থাকে কিন্তু। প্রথমতঃ যথাশক্তি সাবধান হইয়া চলা। সেই জন্যই বলা হয় সুকৌশলেই এই রাস্তায় প্রবেশ।

কোন সময়ে কাহারও ইহাও হইতে পারে কিন্তু — দীক্ষাদি নিয়া বাহিরের পূজা ইত্যাদি সব শিখিয়া — যেমন কীর্তন, গ্রন্থাদি হইতে ভগবৎ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া লোককে শুনান, পূজা, জপ, ধ্যানাদি করান, প্রণাম করিতে দেওয়া, স্পর্শেও কোনভাবে আশীর্বাদের প্রকাশ করা, ফুল গন্ধ চন্দন মাল্যাদিতে ভূষিত হওয়া ইত্যাদি সাধুদের অনুকরণ কাহারও এইভাব আসিতে পারে।

সাধারণতঃ যাহারা প্রকৃত সাধু চিনে না, একটু ধর্ম পিপাসু তাহাদের কিন্তু ভালই লাগে। একটু আনন্দই পায়। তবে ইহাও ত তোমাদের মুখে শুনা যায় — যাহার আশ্রিত হইবে, সে নিজে যতটা, ততটাই ত সে দিবে। তাহার বেশী ত আর নয়। যদি ভগবানের কৃপা ও শুভ যোগাযোগ হয়, তবেই না ভক্তশিষ্য গুরুকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

যাহার এইভাবে অনুকরণ — এই সব কর্মাদির পূর্ণফল কোথায়? ফল পাইবে না, তাহা নয় কিন্তু এখানে ফল যতটুকু পাইবার কেবল ততটুকুই। কেননা ইহার পিছনে প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা, বাসনার মূল রাখিয়া ইহা করা কিনা।

যেমন কোন সাধক ও গৃহস্থ প্রারম্ভে সমস্ত বিষয়বাসনার তাড়না হইতে নিজে উদ্ধার পাইবার জন্য ভগবানের নামে, পাঠে, কীর্তনে, ধ্যান, জপ ইত্যাদিতে মূল লক্ষ্য — নিজেকে বাঁচান, নিজেকে পাওয়া। অমৃতত্বই তার লক্ষ্য। পরম চরমই তার লক্ষ্য। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, প্রশংসার বাসনা বলে বিষয় জড়িত থাকে কিনা, তাহার ফলটিও আবার পূর্ণাঙ্গীন পাইবে। কেননা, সে ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মোহ ইত্যাদির হাত এড়ায় নাই বলিয়া — চাপা রাখিয়া অনুকরণ — এগুলি তাড়নার ফল দিবে।

কীর্তনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ

এই শরীরে শোয়ার ভাবটি পূর্বের হিসাবে চলিতে লাগিল। সময় নাই, অসময় নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই, যখন তখন যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত।

এ শরীর যখন শশাঙ্কবাবুর দেশের বাড়ীতে গিয়াছিল, তখন এ শরীরকে খুকুনীর মামার বাড়ী নিয়া যায়। সেখানে ভোগাদি হইল — খুব সুন্দর কীর্তনও হইয়াছিল। ইহার ভিতর দেখা গেল, ঐ কীর্তনের কেমন এক মহান ভাবে শরীরটা এলাইয়া গড়াইতে গড়াইতে হাত মাথা নীচুর দিকে ধীরে ধীরে শরীর কেমন এক অবলম্বন বিহীন হইয়াও যেন কোন অবলম্বন লইয়া ধীরে ধীরে সর্পের গতির মত বারান্দার উঁচু ভিটা হইতে উঠানে চলিয়া গেল। শরীরটা একেবারে ধপ্ করিয়া পড়িয়া যাওয়া, তাহা নয়। এত উঁচু ভিটা হইতে বিনা সিঁড়িতে এইরূপ ভাবে যাওয়ায় সকলেই আশ্চর্য বোধ করিল। সেই ভাবভঙ্গী ভাষায় বলিয়া বুঝান যায় না। তীব্র গতিতে কি রকম একটা ভাবে। সমগ্র শরীর লাল আভা, তেজঃ-পূর্ণ। ভাবে চল চল। চক্ষের ভঙ্গীও কি রকম, ভাবটি যে কি সুন্দর!

ক্রমশঃ শরীর দাঁড়াইয়া দুই বাহু উর্ধ্বে — কি এক ভঙ্গি। সেই সময় দেখা গেল, সমস্ত শরীরের লোম কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। লোমের গোড়া ফোড়ার মত ফুলা। এইরূপ ত কতই হইত, কোন দিন তাহাতে রক্তের মত।

সাহবাগেও কখনও কখনও ঐ রকম, ঐ ভাব লইয়া এই শরীর একভাবে দিনের পর দিন পড়িয়া থাকিত, কখনও উঠিবার সময় গালে, মুখে লালা — কোথা হইতে এত বাহির হইত! খুকুনী মুছাইত, মুছাইয়াও যেন কুল পাইত না। কখনও চোখের জলের ধারাও এইরূপ, মুছিলেও মুছা যাইত না। অবিরাম দীর্ঘ সময় চলিয়া যাইত।

রমনা আশ্রমেও যখন দুই তিন দিন ও কত কত সময় পরে উঠিত মুখের লালা ইত্যাদি দেখা যাইত। খুকুনী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধাক্কা দিতে দিতে এক একবার চক্ষু খুলিত আবার যেন এইদিকের খেয়াল কোথায় ডুবিয়া যাইত। কখনও হাসি, কখনও কি রকমভাবে

চক্ষু খুলিত। কথাও ঐ সময় আধো আধো, কি রকম ভাষা, বলা যায় না। নানা সময়ে নানা রকম ভাব দেখা দিত। কোন সময় ত একেবারে কাঠের মত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা, অনেক ঘসাঘসিতেও গরম হইত না। কত আঘাত দিয়াও দেখা গিয়াছে — কোথায় সাড়া? শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিই বা কোথায়? তখন সকলে ভয়ে কান্নাকাটি, নানা রকম কত কিছু — আর বুঝি একে এ দেহে পাইলাম না। এই রকম কতদিন কত রকম কতভাব গিয়াছে — উপায় আর কতটুকু।

মুখ ধোয়া, স্নান, কাপড় ছাড়া বা শরীরের অন্যান্য নিত্য স্বাভাবিক কর্মাদি সময়ের কিছুই ঠিক ছিল না। এ অবস্থায় কখন কখন এইরূপ হইয়া যাইত যে, কোথায় শরীরটা যায় কোন ঠিক নাই। সামনে আগুন, জল, কাঁটা, গর্ত যাহা থাকুক না কেন, কোন খেয়ালই নাই। হয়ত কোনদিন দৌড়াইয়া হঠাৎ কোথায় যাইয়া পড়িয়া থাকা হইত। কোনদিন বেশী সময় পড়িয়া থাকিত। কোনদিন অল্প সময়েই উঠা হইত। ভোলানাথ দেখিলে ধরিয়া আনিত। খুকুনীও কোন সময় দৌড়াইয়া ধরিত। যখন ঐ রকম ভাব হইত, তখন শরীর থাকে কি যায়, কিসের উপর দিয়া কোথায় বা কেন যাইতেছে, কিছুই খেয়াল থাকিত না। গায়ে কাপড়াদিও ঠিক থাকিত না। কীর্তনে কাপড় ঠিক থাকিত না বলিয়া ভোলানাথ সর্বদা সেমিজ ব্যবহারের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। পূর্বে কেবল একখানি কাপড় মাত্র পরা থাকিত।

শরীরের এ অবস্থা দেখিয়া সকল সময় কেহ না কেহ সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কিছুদিন এইরূপে চলিল। সেই সময় খাওয়ারও কোন নিয়ম ছিল না। যখন উঠিতাম সামান্য ফলাদি বা ক্বচিৎ অল্প দুধ খাইতাম। কোনদিন কীর্তনের পর অনেক সময় অবধি পড়িয়া থাকা হইত। আবার অল্প সময়েও উঠা হইত। একদিন সাহবাগে কীর্তনের পর দেখিলাম যে কীর্তনের মাঝখানে পূর্বের মত শরীরটা হইল। পরে উঠিলাম এবং আসন করিয়া অনর্গল সংস্কৃত স্তব স্তুতি ও মন্ত্রাদি বাহির হইতে লাগিল। স্তব ও মন্ত্রাদি বলিতে বলিতে কান্নার ভাব আসিল। পরে আবার মন্ত্রাদি বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক মাটিতে যেইরূপে নমস্কার করে, সেইভাবে শরীরটা মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। ইহার পর হইতে কীর্তনে প্রায়ই কোন দিন অল্প বা কোন দিন বেশী সময় নিয়া মন্ত্র স্তবাদি বাহির হইত। কোনদিন দেখা যাইত 'হরিবোল' সকলের সঙ্গে হইতে হইতে পরে স্তব ও মন্ত্রাদি বাহির হইত। একদিন খুব কীর্তন হইতেছে, শরীরটা ঢলিয়া পড়িয়া উঠিয়া পূর্বের মত দাঁড়াইয়া সকলের সঙ্গে ঘুরিতেছে, সকলে সরিয়া সরিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিতেছে আর একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে আবার মধ্যে মধ্যে সামনের পা দুইটা তুলিয়া দুই পায় নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে, এই শরীরটার সামনে সামনে। তাহার পর হইতে দেখিতাম কুকুরটি কীর্তন আরম্ভ হইলে যেখানে বসিতাম ঠিক সেখানে আসিয়া বসিত ও কোন কোন সময় হাঁটুর উপর মাথা দিয়া পড়িয়া থাকিত। হরিরলুট হইলে বাতাসা ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাইত। কেহ উহাকে তাড়া করিলে খাইত না। এই শরীরের গড়াগড়িতে বা চলার অবস্থায় কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত বলিয়া কখনো কখনো উহাকে বাঁধিয়া রাখিত। কিন্তু সে আসিবার জন্য এমন অস্থির আগ্রহ দেখাইত যে বাধ্য হইয়া আবার তাহাকে ছাড়িয়াও দেওয়া হইত।

ঢাকায় ধানকোড়ায় ৺দীনেশবাবুর বাড়ীতে একদিন কীর্তন হইল। এই শরীরের পূর্ববৎ অবস্থা। সেইদিন ছিল বুধবার। তাহাদিগকে বলিয়া আসা হইল তোমরা প্রতি বুধবার কীর্তন করিও। তাহারা তাহাই করিত। এ শরীরও মাঝে মাঝে যাইত।

সাহবাগে বাহিরের লোকের আসা নিষেধ হইলে সকলকে বলিলাম — তোমরা ৪/৫ বৎসরের জন্য সপ্তাহের প্রতি বুধবারে এক একজনের বাসায় কীর্তনের বন্দোবস্ত করিয়া সান্ধ্য কীর্তনটা বজায় রাখ। ঐ সময়ের ভিতর রমনা আশ্রম হয়। আশ্রম হওয়ার পর অনেক বাড়ীর কীর্তন বন্ধ হইয়া যায়।

সাহবাগে একদিন বসিয়া আছি। হঠাৎ কি খেয়াল হইল ছুটিয়া যাইয়া বাগানে একটি গভীর জলের চৌবাচ্চা ছিল, ধপ্ করিয়া তাহার ভিতর পড়িলাম। স্থানটি অপরিষ্কার। তখন সন্ধ্যা। অন্ধকার হইয়াছে। ভোলানাথ পিছনে পিছনে আসিল। একলা কি করিবে ভাবিতেছে। এমন সময় আপনা আপনি কেমন করিয়া উহার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিলাম। ভোলানাথ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল — কি করিয়া উঠিলে? বলিলাম — কেন আমি ত সহজ ভাবেই উঠিয়াছি।

একদিন কীর্তনে মাটিতে পড়িয়া আছি। কোথা হইতে আমি নিজেই দেখিতেছি — এ শরীরটা পড়িয়া আছে, আমি সকলের মুখে কীর্তন করিতেছি, আর আমিই শুনিতেছি ও কীর্তনের ভাবে আনন্দ করিতেছি। কখনো শোয়া অবস্থায়, কখনো বসিয়া কথা বলিতে বলিতে, কোনদিন স্থিরভাবে বসা অবস্থায়, বা দৌড়াইয়া চলিতে চলিতে খুব হাসি আসিয়া শরীর অবশ হইয়া যাইত ও মাটিতে ঢলিয়া পড়িত। হাসি এইরূপ আসিত যে সকলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও থামাইতে পারিত না। পরে তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে হাসিত। কখনো তাহাদের ভয় হইত যে পাছে না শরীর ছাড়িয়া যায় —এইরূপ অস্বাভাবিক অদ্ভুত হাসি প্রকাশ পাইত। পরে সকলে চিন্তিত হইয়া এ শরীরের হাসি কি করিয়া কমে চেষ্টা করিত। কতক্ষণ এইভাবে চলিয়া আবার আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত। কোন কোন সময়, যে কোনভাবে থাকি না কেন হঠাৎ উন্মাদের মত, যেমন হাসি, তেমন কান্না দুইই রৌদ্র বৃষ্টির মত প্রকাশ পাইত।

অন্নগ্রহণ লীলা

সাহবাগে বাসনাদি মাজিবার জন্য হিন্দুস্থানী একটি বুড়ি ছিল। একদিন সে খাইতে বসিয়াছে। আমি ছেলে মানুষের মত কেমন একটা ভাবে তাহার থালায় ভাতের দিকে দেখাইয়া বলিতেছি — এইগুলি কি ? তুমি কি করিতেছ ? আমিও করিব। কি সুন্দর ভাবে সে মুখে দিতেছে, চিবাইতেছে ও গিলিতেছে — ইত্যাদি হাসিয়া হাসিয়া বলিতে বলিতে তাহার কাছে এ শরীরটা গেল। সে অন্য জাতি, আমি হাঁ করিলে পাছে সে আমার মুখে দেয় এইজন্য ভোলানাথ যাইয়া জোর করিয়া আমাকে টানিয়া আনিল ও বলিল — তুমি ত এখন মাটিতে পড়া ফল ছাড়া কিছু খাও না। এ যে ভাত। ভাতও চিনিতে পারিতেছ না ? তোমার যে সব ভুল হইতে লাগিল।

ইহার পূর্বে একদিন একটি কুকুর খাইতেছিল — ছেলেমানুষের মত উহার নিকট যাইয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে "আমি খাইব, আমি খাইব" এই হইতেছিল। সেই দিনও ভোলানাথ আমাকে টানিয়া নিয়া আসিয়াছিল। কোন সময় আমি খাইব, বা এইটি করিব, এ সব কথা বলিতে বলিতে কাহারো বাধা পাইলে ছেলেমানুষের মত শরীরটা

মাটিতে পড়িয়া যাইত। দেহের কোন রকম স্পন্দন থাকিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। এইরকম নানারকম ছুটাছুটি ভাবের ভিতর দিয়া কয়েকদিন কাটিতে লাগিল।

একদিন সকলকে বলিলাম — দেখ, আমার খেয়াল থাকুক আর না থাকুক, তোমরা তিনটি ভাত রোজ খাওয়াইবে। তাহা না হইলে যেমন হাতে খাওয়া হয় না, তেমন ভাত না খাওয়ার দিকটাও হইতে পারে। কিছুই ঠিক নাই। মানুষ ত্যাগের চেষ্টা করে, এই শরীরের সবই বিপরীত, যাহাতে ত্যাগ না হইয়া যায় সে ব্যবস্থা করিতেছে। ত্যাগ ভোগে আটকাইয়া থাকিলে ত চলিবে না! ত্যাগ ভোগের পরপার চাই। সকলে বিশেষ স্মরণ করিয়া রোজ তিনটি করিয়া ভাত খাওয়াইয়া দিত। সে তিনটির সঙ্গে যদি সামান্য একটু কণাও অতিরিক্ত মুখে পড়িত তাহা গিলিতে পারিতাম না। জিব দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতাম। এই সঙ্গে তিন ঢোক জলও খাইতাম। শুনিয়াছি এইভাবে প্রায় ৬ মাস চলিয়াছিল।

সাহবাগে কালীপূজা

দীপান্বিতা আসিয়াছে। সকলে বলিল — ঐবার মা কালীপূজা করিয়াছিলেন, আমরা অনেকে দেখি নাই। এইবার মাকে কালীপূজা করিতেই হইবে। সুরেনবাবু (পোষ্ট মাষ্টার) প্রায়ই এইকথা বলে। এ শরীর 'না, না' করিতেছে। ইহার ভিতর একদিন প্রফুল্ল-বাবুর স্ত্রী হিরণ ও আরো কে কে আসিয়া বলিল — ঐবার পূজায় বড় আনন্দ হইয়াছিল, এইবার পূজা আবার মাকে করিতেই হইবে।

শশাঙ্কবাবুর বাসায় প্রায়ই লইয়া যাইত। সেখানে ভোগাদিও হইত ও বাড়ির ছোটবড় সকলেই খুব আনন্দ পাইত। উক্তদিন শশাঙ্কবাবুর বাসায় গাড়ীতে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, লাট সাহেবের বাংলোর নিকট যে পুকুরটি আছে সেইটির বরাবর ছাদ দেওয়ালের সামনে প্রায় আঠার হাত উঁচুতে, শূন্যে চলার অবস্থায় ন্যাংটা এক সজীব কালীমূর্তি, আমাকে দেখিয়া উপর হইতে হেলিয়া হাত বাড়াইয়া যেমন কোলে আসিতে চায় সেইভাবে, আমার দিকে তাকাইল। আমারও বাম হাত উপর দিকে উঠিয়া গেল। ভাবটাও যেন হঠাৎ কেমন হইয়া গেল। গাড়ীর ভিতর যাহারা ছিল, সকলে উহা লক্ষ্য

করিল। ভোলানাথ বারে বারে জিজ্ঞাসা করে — কি হইয়াছে? সেই বাসায় যাইয়া খাইতে বসিয়াছি তখন দেখি ভোলানাথ ও এ শরীরে মধ্যের জায়গায় সেই ন্যাংটা কালীমূর্তিটি ছোট্ট বালিকার মত আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্বেকার মত আমি বাঁ হাতখানি উঠাইলাম। দেখিতে দেখিতে মূর্তিটি সেইখানেই মিশিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এই শরীরটা মাটিতে শুইয়া পড়িল। উঠিলে ভোলানাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম — বলিতে পারিতেছি না। জিজ্ঞাসা করিও না। সাহবাগে ফিরিয়া আসিলাম।

পরে একদিন আমি রান্নাঘরে কি কাজে গিয়াছি, সেখানে দেখিতেছি যে, যেন ভূদেববাবু সাহবাগে আসিয়া ভোলানাথকে বলিতেছে যে, কালীপূজা হইবে না শুনিলাম। কেন হইবে না? পূজা করুন। ঘরে ফিরিয়া ভোলানাথের নিকট শুনিলাম যে বাস্তবিকই ভূদেববাবু তাহাকে ঐ কথা বলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা সুরেনবাবু আসিল। সে কালীপূজার কথা আবার তুলিল। বলিল — পরশুদিন কালীপূজা, সময় ত আর নাই। আমি ভোলানাথকে বলিলাম — দেখ সকলে মিলিয়া এত আবদার করিতেছে, তুমিই পূজা কর না কেন? সকলে আনন্দ পাইবে। ইহা বলিতে বলিতে শরীরটা কেমন যেন হইয়া গেল। আমি অন্য ঘরে যাইয়া অবশের মত পড়িয়া রহিলাম। ভোলানাথ সুরেনবাবুকে ডাকিল এবং বলিল — তোমাদের মা এইরূপ বলিয়াছে। একবার যখন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন পূজা হইবেই। তোমরা আয়োজন কর। সব জিনিষের ফর্দাদি করিয়া সুরেনবাবু বলিল — মূর্তির কি হইবে? যখন তখন ত মূর্তি পাওয়া যায় না। মাত্র একদিন মাঝে, ইহার ভিতর কি মূর্তি তৈয়ারী হইবে? ভোলানাথ বলিল — এখনই মূর্তির জন্য শহরে যাও। সুরেনবাবু মূর্তির মাপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভোলানাথ তাহাকে নিয়া এ শরীরের নিকট আসিল। শরীরের অবশ ভাব ও শোয়া অবস্থা দেখিয়া, সময়ও আর নাই, রাত্রি প্রায় তখন ১১টা, তাহার এক খেয়াল হইল যে রাস্তায় গাড়ীতে ও শশাঙ্কবাবুর বাসায় যে হাত উঠাইয়াছিলাম, ততটা মাপ দেওয়া যাক। আমি বসিয়া হাত তুলিলে যতটা উঁচু হয়, আন্দাজ করিয়া সে মাপের মূর্তির জন্য সুরেনবাবুকে বলিয়া দিল। সুরেনবাবু বাজারে চলিয়া গেল। একজন কারিগর বলিল — আমার নিকট ১২ খানি কালীমূর্তির ফরমাইস ছিল, সে কয়খানি শেষ হইলে মনে হইল, আর একখানি একটু বড় করিয়া করি। সেইখানি আছে, নিতে পারেন। সুরেনবাবু মাপের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে মাপ অবিকল ঠিক আছে। সুরেনবাবু আনন্দের সহিত সে মূর্তিতে রং দিয়া শেষ করিতে বলিল।

কালীমূর্তি সাহবাগ আসিলে দেখা গেল যে তাহার রংটাও যেন অন্য রকম। সাধারণতঃ কৃষ্ণমূর্তির রং যেরূপ হয়, কতকটা সেই রকম। এ শরীর যে ন্যাংটা মূর্তি শূন্যে দেখিয়াছিল, সমুদয় অবয়ব সেই রকম, কেবল নীচে শিব বেশী আছে। পূজার আয়োজনাদি যথাবিহিত হইল। পূজার পূর্বে ভোলানাথ এ শরীরকে পূজা করিতে বলে। প্রতিবাদ করিলে বার বার বলে, না তোমাকেই করিতে হইবে।

এ শরীর পূজা করিতে বসিল। কেমন একটা শরীরের ভাব হইয়াছিল। যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই ভাল বলিতে পারিবে। যজ্ঞ ইত্যাদিও এক রকম কিভাবে হইয়া গেল। যজ্ঞ করিয়া যখন অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিতে যায়, তখন এ শরীরটা মাটি হইতে উঠিয়া হাত বাড়াইল। আজও সেই অগ্নি রক্ষিত হইতেছে।

পরদিন ৺নিরঞ্জনের স্ত্রী ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া মূর্তিকে ধান দুর্বা দিল। ইহার মধ্যে ৺নিরঞ্জনের স্ত্রী বলিল — মা! কি সুন্দর মূর্তি। আমার বিসর্জন দিতে ইচ্ছা হয় না। তখন বলিলাম, তবে বুঝি এ মূর্তি বিসর্জিত হইতে চায় না। মূর্তি বিসর্জন দেওয়া গেল না। নিত্য পূজার ব্যবস্থা করা হইল।

যজ্ঞাগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা

সেই রাত্রিতেই আগুন নিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলা হইল কে এই আগুন নিয়া এখনই বসিয়া যাইতে পারে। শশাঙ্কবাবু বলিল — মা! আমি বসিতে প্রস্তুত। বলা হইল ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর। শশাঙ্কবাবু বলিল ছেলেদের কি জিজ্ঞাসা করিব। আমি কোন কর্তব্য ছেলেদের উপর ফেলিয়া আসিতেছি না। ছেলেরা উপস্থিত ছিল। তাহারাও বলিল আমাদের কিছু বলার নাই। তখন শশাঙ্কবাবুর হাতে আগুনটা দেওয়া হইল। সে তাহা নিয়া

যেখানে পূজা হইয়াছিল সেইখানে গিয়া বসিল। সেই দিন হইতেই সে ওখানে সাধন ভজন নিয়া থাকিতে লাগিল। পরে শশাঙ্কবাবু ও খুকুনী সাহবাগে থাকিয়া অগ্নি রক্ষার ভার লইল। কিছুদিন এইরূপে চলিতেছে।

শশাঙ্কবাবুর গুরুদেব ঢাকা আসিলেন। এ শরীর তখন শশাঙ্ক বাবুকে বলিল — বাসায় গুরুদেব, তাঁহার কাছে যাও। সে তাহাই করিল। পরে প্রতিদিন বাসা হইতে সাহবাগে আসিত এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাত্রিতে এখানেই থাকিত।

বীরেনের কালীপূজা

শশাঙ্কবাবুর বড় ছেলে বীরেন ইহার পূর্বেই ঢাকা আসিয়াছে এবং সাহবাগে প্রায়ই আসিয়া সৎ আলোচনাদি করিত। একদিন বীরেন আসিয়া বলে — মা, আমি এই কালীর উপর পূজা করিব। ব্যবস্থাদিও করিল। পাঁঠা বলি দিবে, তাহার জন্য খড়্গ ধার দিতে গিয়া বীরেনের হাতে লাগিল এবং রক্ত বাহির হইল। তখন এ শরীর বলিল — এই রক্ত বেলপাতায় করিয়া মাকে দিয়া দাও। পরে যখন পাঁঠা উৎসর্গ করিয়া বলি দিতে নিল, তখন এ শরীরটা উঠিয়া বলির স্থানে যাইয়া পাঁঠার ঘাড়ে হাত দিল। যে বলি দিতেছিল, সে খড়্গ তুলিতে গিয়া থামিয়া গেল। পরে তাহাকে বলিলাম — পাঁঠাটিকে রমনার মাঠে নিয়া চল। সাহবাগ হইতে বাহির হইয়া রমনার মাঠে অতিদূরে পাঁঠাটিকে রাখিয়া ফিরিবার সময়ে ভোলানাথ বলিল — পাঁঠাটিকে শেয়ালে খাইবে। এ শরীর কিছু না বলিয়া সকলের সঙ্গে সাহবাগে ফিরিতে না ফিরিতেই দেখে, পাঁঠাটি ডাকিতে ডাকিতে এ শরীরের কাছে চলিয়া আসিয়াছে। পূজাদি শেষ হইল।

পরে দেখা যাইত পাঁঠাটি ঘুরিয়া ফিরিয়া বাগানেই থাকিত। সন্ধ্যা হইলে আপনা আপনিই আমরা যে ঘরে শুইতাম তাহার এক কোণে অতি সন্তর্পণে পড়িয়া থাকিত। ঠাণ্ডার দিনে ইহার গায়ে কিছু দেওয়া হইত।

যখন কীর্তন হইত, তখন পূর্বকথিত কুকুরটি ও এই পাঁঠাটি এ শরীরের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকিত। সময় সময় দুই হাঁটুর দুই

দিকে মাথা দিয়া দুইটি পড়িয়া থাকিত। কোন কোন দিন কীর্তনে এই শরীর চলিতে থাকিলে ইহারাও পিছু পিছু যাইত। এ শরীরকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল — এ পাঁঠাটি পূর্বজন্মে কি ছিল? মুখে বাহির হইল — সন্ন্যাসীর বেশধারী, দেখ না কম্বল গায় দেয়। মুক্ত ভাবে চলে, যাহা পায় তাহাই খায়। আমরা যখন ঢাকা হইতে কিছুদিনের জন্য একবার বাহিরে গেলাম, তখন ফিরিয়া আসিয়া পাঁঠাটিকে আর দেখা গেল না। কেহ কিছু দেখিয়াছে বলিয়াও বলিতে পারিল না।

যজ্ঞাগ্নি কুণ্ডে স্থাপন

কিছুদিন পর ইহা স্থির হইল যে যজ্ঞের অগ্নি কুণ্ডে রাখা হইবে। স্থান নির্দিষ্ট করিয়া ভোলানাথকে বলা হইল — একটি গর্ত কর, আর তিনটি বটপাতা আন। সেইখানেই বটগাছ ছিল, পাতা আনিলে যজ্ঞের একটি কয়লা নিয়া তিনটি পাতায় তিন রকম ভাষায় তিন লাইন এ শরীরের হাত দিয়াই আপনা হইতে লেখা হইল। ঐ পাতাগুলি গর্তের ভিতর রাখিয়া, গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া তাহার উপর শাস্ত্রীয় বিধিমত যজ্ঞকুণ্ড করা হইল। এ শরীরের সেই সময় খেয়াল হইতেছিল, ভাষা সৃষ্টির আরম্ভে যে ভাষা, তাহারই এই তিনটি। জাগতিক হিসাবে সংস্কৃত ভাষাটি পরিষ্কার খেয়ালে প্রকাশ হইল। কোন দিন যজ্ঞকুণ্ড করা হয় নাই, উপস্থিত মত সব হইয়া গেল। পরে শোনা গেল, শাস্ত্রীয় বিধিমতই আকার ও মণ্ডলাদি হইয়াছে।

যজ্ঞের অগ্নি কুণ্ডে রাখিয়া, কালী অন্য ঘরে সরান হইল। যজ্ঞের অগ্নি অপ্রকাশ হইলে কি ব্যবস্থা করিলে পুনরায় অগ্নি প্রকাশ হইবেন, তাহাও বলিয়া রাখা হইল। এত দিন পরে এইবার কেমন একভাবে এই কথাটা বলিবার খেয়াল হইল।

পরে কলিকাতা যাওয়া হইল। সেখানে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বীরেনের সঙ্গে আলোচনা করা হইতেছে, ইহার মধ্যে হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইল — অগ্নি অপ্রকাশ। পরে জানা গেল কি, সেই সময় অগ্নিদেব অপ্রকাশ হইলেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ব নির্দেশানুসারে অগ্নিদেব প্রকাশ হইয়াছিলেন। আবার যখন আদিনাথ যাওয়া হইয়াছিল, তখন শরীরের পিতা ও সীতানাথ সঙ্গে ছিল। হঠাৎ এক সময়

বলিয়া উঠিয়াছিলাম — অগ্নি অপ্রকাশ। অনুসন্ধানে তাহাও সত্য বলিয়া জানা গিয়াছিল। অবশ্য এ সময়ও অগ্নি অপ্রকাশ হওয়া মাত্রই পূর্ব নির্দেশানুযায়ী প্রকাশিত করা হইয়াছিল। এতদিন যাবৎ যজ্ঞের অগ্নিরক্ষা হইতেছে, কিন্তু কোন দিন এই কথা আসে নাই। হঠাৎ খেয়ালে আসিল যাহারা অগ্নিরক্ষা করে, তাহাদের কাছে বলা হইল — যদি কখনও এই যজ্ঞাগ্নি তোমাদের কাছে অদৃশ্য দেখ তবে এই নিয়মে অগ্নি প্রকাশিত করিও। প্রথমে আদিনাথ হইতে দেখা হয়, পরে কলিকাতা থাকিয়া দেখা হয়। কেমন সুন্দর, এই শরীরটা শুইয়া আছে — পূর্ব দিকে মাথা, আশ্রমের দিকে পা। হঠাৎ দেখা গেল পশ্চিম দিক দিয়া একেবারে সামনে একটি অগ্নির শিখা বাঁকাইয়া, উত্তর দিক শিখার অগ্রভাব রাখিয়া ঠিক মূর্তির মত আসিয়া এ শরীরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তখন মুখ দিয়া বাহির হইল — অগ্নি ওখানে অপ্রকাশ। অর্থাৎ ঢাকায় অগ্নি অদৃশ্য, এ শরীরটির কাছে দৃশ্য। কোথায় ঢাকা, আর কোথায় আদিনাথে এ প্রকাশ। কলিকাতায়ও গভীর রাত্রে বসিয়া কথা বলা হইতেছে — ঐভাবে সোজা মূর্ত আকারে আসিয়া প্রকাশ। আরও কৃচিৎ কখনও এইরূপ হইলে, এই জাতীয় প্রকাশ। কাজেই তোদের দৃষ্টিতে অগ্নি অদৃশ্য হইলেও বাস্তবিক পক্ষে অগ্নি অখণ্ড ভাবেই ছিল ও তোদের সেবা নিতেছেন।

দেরাদুন আসিবার (১৯৩২ ইং) পূর্বে শরীরের খেয়াল অনুযায়ী সেই অগ্নিতে প্রায় লক্ষ আহুতি দিয়া, পূজাদি করিয়া, নারিকেল তেলের বাতির দ্বারা সে অগ্নি অখণ্ডভাবে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নারিকেল ফল, সেই তৈলই প্রশস্ত খেয়ালে আসিল। প্রত্যহ যজ্ঞ হইবার সময় সেই বাতি হইতে আগুন নিয়া আসা হয়। পরে বড় পণ্ডিতদের কাছে শোনা গেল, শাস্ত্রবিহিত মতেই সব করা হইয়াছে।

শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে দুর্গাপূজায়

শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে বার্ষিক দুর্গাপূজা হয়। তিন দিনই বলি দেওয়া হয়, তদুপরি তাহার কল্যাণার্থ একটী পাঁঠা বেশী বলি হইত। একবার পূজায় সেখানে ছিলাম। দেখিলাম, অতিরিক্ত পাঁঠাটির বলির সময় এ শরীর যাইয়া পাঁঠার গলার উপর হাত পাতিয়া দিল। খড়্গ উঠাইয়াছিল অল্পের জন্য এ শরীরের হাতের আঙ্গুল বাঁচিল। যিনি খড়্গ উঠাইয়াছিলেন, তিনি তো ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এ শরীরের তখন কোন খেয়ালই ছিল না, কি জন্য কি করা হইতেছে। খড়্গ নামাইয়া নিল, পাঁঠাটি ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে তখন ডাকিতে ডাকিতে আসিয়া এ শরীরের পায়ের কাছে মাথা দিয়া ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। সেই হইতে এই বেশী বলি দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল। পরে সেই পূজায় একটি পাঁঠা বলিতে আটকাইয়াছিল সকলেই চিন্তিত। এ শরীর বলিল — এখনই একটি ডাব গাছ হইতে লইয়া আস। ডাব আনিলে, — এ শরীর বলিল এইটিকে এক ঘায়ে বলি কর এবং ইহার জল রুধির জ্ঞানে উৎসর্গ কর। বলি হইলে দেখা গেল আপনা আপনিই এক পাশের খোলে কতটুকু জল রহিয়া গিয়াছে। তাহাই নিবেদন করা হইল। এই ঘটনার পর হইতেই শশাঙ্কবাবুর পূজায় পাঁঠা বলি বন্ধ হইয়া যায়।

নির্মলবাবুর বাসায় মায়ের সূক্ষ্মে গমন

ঢাকায় একদিন শুইয়া আছি, দেখি কি এ শরীর বেনারসের নির্মলবাবুর বিছানায় বসিয়া আছে। আমি উঠিতেই খুকুনী বলিল — নির্মলবাবুর খুব অসুখ বেনারস হইতে খবর আসিয়াছে। হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম — এই মাত্র ত সেখান হইতে আসিলাম। পরে জানা গেল যে ঠিক সেই সময় তাহাদের বাসায় নির্মলবাবু এই শরীরকে তাহার শিয়রে বসা দেখিয়াছিল। নির্মলবাবু সেইবার ভাল হইয়া গেল।

কমলাকান্তের মাতৃদর্শন

কমলাকান্ত নামক একটি ছেলে কিছুদিন হয় মেট্রিক পাশ করিয়াছে, ঢাকা ফার্মে থাকে। সে একদিন সাহবাগে আসিয়া বড় বড় চোখ করিয়া এক দৃষ্টিতে অনেকদূর হইতে এ শরীরের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিয়াছে। সাধারণ ছেলেপিলে হইতে তাহার ভিতর কিছু পার্থক্য দেখিয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলাম, পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিলাম — তোমার যখন

ইচ্ছা আসিও। সে-ও সাহবাগে যাওয়া আসা করে। কয়েকমাস ধরিয়া তাহার বরাবর জ্বর হইতেছে, কিছুতেই সারে না। ডাক্তারেরা কালাজ্বর বলিয়াছে। এ শরীরের কি খেয়াল হইল, তাহাকে বলিল — জল দেওয়া বাসি ভাত এখানে আছে, তুমি তাহা খাও। সে অতি সন্তুষ্ট হইয়া খাইল। দেখা গেল পরে তাহার জ্বর আস্তে আস্তে সারিয়া গেল।

একদিন সে বেলা প্রায় ১১/১২টায় আসিয়া দুঃখ করিয়া জানায় যে স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে বলিয়াছে — তোমার বড় সংসার বুদ্ধি, ইহা শুনিয়া অবধি তাহার প্রাণে বড় দুঃখ হইয়াছে। সে বলিল — আমার ত সংসার করিবার মোটেই ইচ্ছা নাই। ধর্ম-পথে আমি কি করিয়া চলিতে পারি, আমাকে বলিয়া দিন। আপনি যাহা আদেশ করেন, আমি তাহাই করিব। তাহাকে হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম — তুমি একবার জ্যোতিষের নিকট যাও ত। সে তাহার নিকট গেল ও ফিরিয়া আসিয়া বলিল — আমি তাঁহার কাছে গিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছি। সাধুদের যে সব গুণ ও ভাব আছে বলিয়া পুস্তকে পড়িয়াছি, তাঁহার ভিতর অনেকটা সেই রকম দেখিলাম।

কালী ও যজ্ঞাগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা হইবার পর কমলাকান্ত সাহবাগে থাকিতে আরম্ভ করে। কুলদাবাবু সন্ধ্যার সময় আসিয়া যজ্ঞের কর্মাদি করিয়া চলিয়া যায়। সে ধর্ম-প্রাণ ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে তাহার নিষ্ঠা দেখা যাইত।

জ্যোতিষের অসুস্থতা

পৌষের মাঝামাঝি একদিন জ্যোতিষ সাহবাগে আসিয়া জ্বর হইয়াছে বলিয়া চলিয়া গেল। পরে শুনিলাম সে খুব বেশী অসুস্থ। কমলাকান্ত যাইয়া প্রথম কয়েকদিন তাহার নিকট ছিল ও সর্বদা আমাদের নিকট খবরাদি দিত। কয়েকদিন গেলে ডাক্তারেরা বলিল যে তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। আমরা মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে যাইতাম। নিরঞ্জন আসিয়া প্রায় প্রত্যহই খবরাদি দিত। তাহারা দুইজন যেন এক জোড়া দেখাইত। কেহ কোনদিন কাহাকেও ফেলিয়া এ শরীরের নিকট একা আসিত না। একদিন নিরঞ্জন বলিল যে মা, জ্যোতিষ ডাল ভাত খাওয়ার জন্য অস্থির হইয়াছে

কিন্তু ডাক্তারেরা দিতে চায় না। অবস্থা খুবই খারাপ, যদি না বাঁচে বড়ই দুঃখ থাকিবে। তখন তাহার অসুখের খুব বাড়াবাড়ি, কাসি অত্যধিক। মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে। সাহবাগে যাহারা আসে প্রায়ই লোকে তাহাকে দেখিয়া আমাদের নিকট দুঃখ করে আর যাহাতে বাঁচে প্রার্থনা করে। তখন খুকুনী প্রায় সর্বদা এ শরীরের কাছে থাকিত। সে বলিত — মা! জ্যোতিষদাকে বাঁচাইতেই হইবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় সাহবাগে কীর্তনে বসিয়াছি, আমি দেখি কি উপস্থিত অনেকের মুখে যেন রক্ত। কীর্তনের পর ভোলানাথকে এই কথা বলিলাম, তিনি বলিয়া উঠিলেন — তবে কি জ্যোতিষের মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ইহা বলিয়া তিনি তাহার নিকট তখনই চলিয়া গেলেন এবং বাস্তবিক তাহাই দেখিলেন। হঠাৎ একদিন কিরূপ খেয়ালে আসিল যে ডাল ও ভাত মিলাইয়া নিয়া আমি এবং ভোলানাথ জ্যোতিষের বাসায় গেলাম ও তিনবার তাহার মুখে তিন গ্রাস দিলাম। সে খুব তৃপ্তির সহিত খাইল। সঙ্গে সঙ্গে খেয়ালে আসিল, যতটা ভাত খাওয়াইলাম, ততদিন সে বাঁচিবে। আর সে যে চেয়ারে প্রত্যহ বসিত তাহার পিছনের পায়ার মাথায় স্ক্রু প্যাঁচের গোল কাঠটি আসিবার সময় হাতে করিয়া আনিলাম। ভোলানাথের হাতে ঐটি দিয়া বলিলাম — যখন জ্যোতিষ ভাল হইয়া আমাদের কাছে আসিবে, সেইটি যেন আমাদের নিকট হইতে হাতে করিয়া লইয়া যায়। ভোলানাথ উহা রাখিয়া দিল, পরে তাহাই করা হইয়াছিল।

কয়েকদিন গেলে আমি ও ভোলানাথ এক রাত্রিতে তাহার বাসায় যাইয়া সারারাত্রি কাটাইলাম। সাহবাগ হইতে যাইবার সময় একটি বাঁশের কঞ্চি নিয়া গিয়াছিলাম। আমি উহা দিয়া রোগরূপী যে মূর্তি জ্যোতিষের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া জোরে তিনটা ঘা তাহার গায়ের উপর দিলাম এবং সে কঞ্চিটিও তাহার ঘরের জানালার উপর রাখিয়া আসিলাম। তাহার পর হইতে সে যতদিন পূর্বের বাড়ীতে রোগাবস্থায় ছিল ততদিন আমি আর তাহাকে দেখিতে যাই নাই। সেই রাত্রিতে ঐ রোগের মূর্তিটাকে বলিয়াছিলাম — যাহা করিবার তো করিয়াছিস্, এখানেই থামিয়া যা। তাহার পর হইতে তাহার জীবনের আশা একটু দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সারিয়া উঠিতে দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল।

রোগমূর্তি

রোগেরও তোমাদের মত মূর্তি আছে। উহাদের সঙ্গে এ শরীরের অনেক সময় দেখা সাক্ষাৎ ও খেলা হয়। উহারা এ শরীরে আসিলে কখনও তাড়াইয়া দেওয়া হয় না। কাহাকেও ত এ শরীর তাড়াইয়া দেয় না। উহাদেরই বা তাড়াইয়া দেওয়া হইবে কেন? ঐ-ত। আসলে তোমরাও যেমন এ শরীরের কাছে, তাহারাও ঠিক সেই রকম। ডাকিয়াও আনি না, আসিলেও তাড়াই না।

বেনারসে একবার নির্মল বাবুর বাসায় শুইয়া আছি। বাহিরে দেখি কি দুইটি মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাদের অন্য রাস্তায় যাইতে বলিলে, তাহারা চলিয়া গেল। যাহারা সামনে ছিল, তাহাদের বলিয়া উঠিলাম — দুইটি মূর্তি। পরের দিন সাহবাগে যেই দিকে তাহারা গিয়াছিল, সেই দিকে জ্বর ও বসন্ত দেখা দিল। এইরূপ অনেক সময় তাহারা যখন আসে, তখন তোমাদের মত পরিষ্কার তাহা-দিগকে দেখা যায়। যদি খেয়াল হয় তাহা হইলেই উহাদের সঙ্গে এ জাতীয় কথা হয়, নতুবা উহারা আপন স্বভাবে কাজ করিয়া যায়।

শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে মনসা পূজায়

শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে মনসা পূজায় তিন দিন ব্যাপী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আগাগোড়া সেইখানে। তাহার গুরুদেব পূজা করিয়াছিলেন। পূজায় বলির সময় পাঁঠাটির কানও কতকটা কাটা যায়। ইতিমধ্যে কে আসিয়া বলিল জ্যোতিষবাবুকে দেখিয়া আসিলাম। বিশেষ অসুস্থ, আপনাদের দেখিতে চায়। ভোলানাথ শুনিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। আমাকে বলিল — চল। আমি বলিলাম — তুমি যাও, আমি যাইব না। অনেক পীড়াপীড়ি করিলে বলিলাম — তবে আমি তাহার বাসার ভিতরে যাইব না। তাহাই করিলাম। সেইখান হইতে শশাঙ্কবাবুর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কান কাটা যাওয়াতে বলির অঙ্গহানি হইল না ত? সে বলিল — আমরা ত শাস্ত্রে পাই নাই। আমি বলিলাম — এক সঙ্গে দুই অঙ্গ কাটা গেলে আমার খেয়াল হয় যে অঙ্গহানি হয়।

সেইখানে ৩/৪ দিন থাকিয়া পূজার পর আমাদের সাহবাগ যাওয়া স্থির হইল। যাওয়ার জন্য শশাঙ্কবাবু এক মোটর আনিল। ইহার কিছু সময় পূর্ব হইতেই অর্থাৎ দেবী বিসর্জনের পরে শরীরে কেমন একটা ভাব। তাহাদের উপরের ঘরে যাইয়া পড়িয়া আছি। পূজার তিন দিনও পূজার কাছে কতক্ষণ বসিয়া পরে শরীরটা পড়িয়াই থাকিত। কিছুক্ষণ পরে উঠিত। সেইদিন উপরে শুইয়া আছি ইহার মধ্যে যাইবার জন্য ভোলানাথ আমাকে উঠাইলেন। সর্ব শরীর অবশ। দাঁড়াইলাম, কিন্তু যেন চলিতে পারি না। ভোলানাথ তাড়াতাড়ি করিতেছেন, সেইজন্য আমাকে ধরিয়া ধরিয়া উপর হইতে নামাইতেছে। গা ছাড়া অবস্থা। ২/৩ সিঁড়ি দূর দূর যাইয়া পা পড়ে, নিয়মে পড়ে না। এইভাবে সিঁড়ি দিয়া চলিতে চলিতে, দুই পা কেমন হইয়া ঘুরিয়া ৩/৪ ধাপ নীচে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। অমনি উঠিয়াই অনেকটা হাঁটিয়া মোটরে গিয়া উঠিলাম। সাহবাগে নেশাখোড়ের মত অবশ ভাবে পৌঁছিলাম। ঐ অবস্থায় যে ঘরে থাকি, সে ঘরের দরজা পার হওয়ার জন্য পা উঠাইয়াছি, খেয়াল হইতেছে যেন বাম পায়ের হাড়গুলি খণ্ড খণ্ড ভাঙিয়া একটি থলিতে ঝুলাইয়া মাটিতে রাখিলে যেইরূপ হয় — পা খানি ঠিক ঐ রকমে মাটিতে পড়িল। বলিয়া উঠিলাম বাম পায়ে কিছু হইয়াছে। পরে পায়ে একটা ঝাঁকি দিলাম এবং পূর্বের মত এলান ভাবে মাটিতে শরীরটা পড়িয়া গেল। কেহ কেহ আমাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইল এবং পায়ে ভিজা কাপড় বাঁধিয়া রাখিল। সকলে চলিয়া গেলে আমি উঠিয়া কতক্ষণ বেশ হাঁটিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। তখন বেলা ১০/১১টা হইবে। ৪/৫টার সময় উঠিলাম, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছি, এমন সময় খেয়াল হইল যে পায়ে খুব ব্যথা লাগিতেছে। সকলে ভাল করিয়া দেখিল ও বলিল — পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়াছে। পা খানি ফুলিয়া পায়ের নীচটা নীল হইয়া গিয়াছে। তাহারা হাড় ভাঙ্গা পাতা দিয়া পাটি বাঁধিয়া রাখিল। সেইদিন অমাবস্যার ভোগ, অনেকে আসিয়াছে। এ শরীর বেশ হাসিতেছে, আলাপাদি করিতেছে। আমি বলিলাম ৭ দিন এ বিছানা হইতে নামিব না। সেইভাবেই চলিতেছে। ইহার মধ্যে ডাক্তার কি ঔষধ দিতে লাগিল, দেখা গেল না কমিয়া আরো ফুলিয়া গেল। তখন বলিলাম যত ঔষধ বোতলে আছে সব এক সঙ্গে ঢালিয়া এখনই শেষ কর। তাহাই করিল।

আমি ৭ দিন বিছানায় বসিয়া, শুইয়া, দাঁড়াইয়া, হাঁটিয়া কাটাইলাম। ৭ দিন পরে ফুলা কমিয়া গেল।

দেখিতাম, যখন পা ভাঙ্গিয়াছে খেয়াল হইত, তখনই খোঁড়াইয়া চলিতাম, আবার যখন সে খেয়াল থাকিত না, তখন বেশ ভাল করিয়া হাঁটিতে পারিতাম। ইহাতে বুঝিবে শরীর-জ্ঞানই যত দুঃখের কারণ। পা ভাঙ্গিবার কারণ সম্বন্ধে কাহারো কাহারো ধারণা হইয়াছিল যে বলির অঙ্গহানির দোষটা মায়ের উপর দিয়াই কাটাইয়া নিলেন।

পূর্ণকুম্ভে হরিদ্বারে যাইবার আয়োজন

জ্যোতিষের ব্যারামের পূর্বে সে বলিয়াছিল — এইবার হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। আপনারা যাইবেন? বলিলাম — আচ্ছা। সময় আসিলে হরিদ্বার যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল, প্রায় ২০/২১ জন সহযাত্রী হইল। জ্যোতিষ শয্যাশায়ী, কাজেই তাহার যাওয়া হইল না।

রাজেন্দ্র কুশারী ভোলানাথের গ্রামের লোক ও বাল্য বন্ধু। সে কুন্ডুদের বাড়ীতে চাকুরী করে। যোগেন্দ্র কুণ্ডুকে একবার সে সাহবাগ নিয়া আসিয়াছিল। তখন কথা হইয়াছিল যে হরিদ্বার যদি যাওয়া হয়, তখন কলিকাতায় তাহার বাসায় উঠিব। কলিকাতা গিয়া সেই বাড়ীতে উঠিলাম। সে সময়ে শরীরের অস্বাভাবিক ভাবগুলি বিশেষ রূপে দেখা যাইত। সব সময় যেন একটি ভাব-বিহ্বলতা। কখনো কোথাও সিঁড়ি দিয়া উঠিতে বা নামিতে খেয়াল করিয়া ধাপে ধাপে পা দিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাহাতে আরো যেন কেমন হইয়া যাইত। পলকশূন্য অবস্থায় বা কখনো চক্ষু বুজিয়া শরীর ঢলিয়া পড়িয়া যাইত। একটু পরে আবার ঠিক হইত।

সাধকের দিক দিয়া এই কথা যে যখন সাধক আপন ভাবে আপনি তন্ময় হইয়া পড়ে, তখন তাহার জপ, পূজা, ধ্যান ইত্যাদি আর কোথায়? সে সর্বক্ষণ এক মহানভাবে খেলিয়া বেড়ায়। কখনো কখনো কেহ কেহ নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী সাধারণের ভিতর অসাধারণ, বা অসাধারণের ভিতর সাধারণ ভাব লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে পারে। তখন প্রথমতঃ তাহার ভাবোন্মাদনার চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, পরে শরীর অচল, অটল স্থির হইয়া যায়। সাধকের এইরূপ

একটানা অবস্থায় শরীর পর্যন্ত ভাবে তদনুরূপ করিয়া লয়। এ শরীর তখন কি এক ভাবে চলিতেছিল। এখানে কাহারো ইচ্ছা অনিচ্ছার স্থান নাই।

কলিকাতায় মা

ঢাকা নবাব বাড়ীর প্যারীবানু কলিকাতা থাকে। তাহার বাড়ীতে একদিন কীর্তন হইল। আমরা সন্ধ্যায় সেখানে গেলাম। তাহার বড় হল ঘরে অনেক লোক, অনেক মেয়েরাও ছিল। শরীরের টলমল ভাব। কীর্তনের অবস্থাদি প্রকাশ পাইল। প্যারীবানু এবং তাহার ছেলেমেয়ের খুব আনন্দ ও উৎসাহ। প্যারীবানু হরিবোল করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেছিল। তাহার বাড়ীতে পরে আরো কীর্তন হয়, তখন সেখানে সি. আর. দাশের স্ত্রী (বাসন্তী দেবী) ও মেয়ে (অপর্ণা দেবী) আসিয়াছিল। সি. আর. দাশের স্ত্রী নাকি পূর্বে এ শরীরকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল। সে এতদিন খুঁজিয়া পায় নাই যে কাহাকে দেখিয়াছিল। সেইদিন এ শরীরকে দেখিয়া তাহার স্বপ্নের কথা বলিল ও নানা সৎ আলোচনা করিল।

হরিদ্বারে জ্যোতিষের অসুস্থতার সংবাদ

বেনারস গিয়া কুঞ্জবাবুর বাড়ী উঠিলাম। পরে হরিদ্বারে গিয়া ৭ দিন কাটাইয়া হৃষীকেশ গেলাম। হৃষীকেশে মোটর হইতে নামিয়াছি, এমন সময় দেখি দু'খানি টেলিগ্রাম একখানিতে জানা গেল সীতানাথ কুশারীর অবস্থা খারাপ, আর একখানিতে নিরঞ্জন লিখিয়াছে যে জ্যোতিষ বিশেষ অসুস্থ। আমরা তখন কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালায়। সেইখানে ঘরের ভিতর বসিয়া দেখি কি জ্যোতিষ, ছোট ছেলের মত ভাব, এ শরীর যেন তাহাকে কোলে নিয়া বসিয়াছে এবং তাহার স্ত্রী আমার নিকটে দেওয়ালের গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। এই কথা ভোলানাথকে জানাইলাম। ভোলানাথ তার পাইয়া খুব ব্যস্ত হইয়াছিল। তখন কথা হইল যে জ্যোতিষ মরিতে পারে না। ভোলানাথকে বলিলাম এ সম্বন্ধে কাহারো সহিত উপস্থিত কোন আলাপের দরকার নাই।

পরদিন হরিদ্বার ফিরিলাম। শশাঙ্কবাবুকে বলিলাম — পূর্ণ-কুম্ভের মাত্র প্রথম স্নান হইল। তুমি ও খুকুনী থাক। আমরা চলিয়া যাই। তাহারা বলিল — আমরা কুম্ভে আসি নাই; তোমার সঙ্গে থাকাই উদ্দেশ্য। শশাঙ্কবাবুর এক ফাঁড়া ছিল এবং তাহাকে এক সাধু কি কাজ করিতে বলিয়াছিল। বলিলাম — তোমার সে কাজটি এখানে গঙ্গার পাড়ে সম্পন্ন কর।

পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া কয়েক দিনের ভিতর ঢাকা পৌঁছিলাম। তখনো জ্যোতিষ শয্যাগত। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল। তাহার ব্যারামের প্রথম অবস্থায় যখন তাহাকে দেখিতে যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল, তখন নিরঞ্জনকে বলিয়াছিলাম, একতলা বাসা হইলে তাহাকে দেখিতে যাইব। আমরা হরিদ্বার যাইবার পূর্বে তাহাকে সাহবাগের খুব নিকট একটি সরকারী একতলা বাসাতে লইয়া আসে এবং আমরা তাহাকে তথায় দেখিতে গিয়াছিলাম।

একদিন জ্যোতিষের দাদা বলিল — যাহা হইবার হইয়াছে, এখন জ্যোতিষ আপনার নামে আছে। তাহাকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার উপর তাহাকে রাখিয়াছি। তাহার শ্বাশুড়ীও আসিয়াছিল। সে ফিরিবার সময় এ শরীরকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল — আমি আপনার হাতে তাহাকে দিয়া গেলাম। আপনি তাহাকে রক্ষা করিবেন। আমি আর কিছু জানি না। তখন এ শরীরের খেয়ালে একটি ভাব হইয়াছিল যে সে নিশ্চয়ই ভাল হইবে তবে সে আর বেশীদিন সংসারী ভাবে থাকিবে না।

আমরা ফিরিয়া গেলে, তাহাকে প্রত্যহ দেখিতে যাইতাম এবং তাহার জন্য প্রসাদ পাঠান হইত। জ্যোতিষের স্ত্রীও কখন কখন সাহবাগে দেখা করিতে আসিত ও যখন যাহা খবরাদি দিত।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে মা

একবার দেওঘর যাই। তথায় প্রাণগোপালবাবুর গুরুদেব বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। এই শরীরটাকে দেখিয়া আনন্দে মহারাজজী বলিলেন — একবার সূক্ষ্ম শরীরে দেখা দিয়াছিলে, এইবার স্থূল শরীরে দেখা দিতে আসিয়াছ। আশ্রমে একদিন কীর্তনে এ শরীরের অবস্থা পূর্ববৎ

হইল। মহারাজজী ও তাঁহার শিষ্যগণ ঘিরিয়া বসিল ও এই শরীরটা একটু স্বাভাবিক ভাবে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন — দুই না এক। বলা আসিল — এক। মহারাজজী বলেন — দুই। হাসিতে হাসিতে এ ধরণের অনেক কথা হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম — দুই কি রূপে? মহারাজজী বলেন — দুই, এই যে আমি আর তিনি। এ শরীর বলিল — আমাকে ছাড়া ত তিনি নয় আবার তিনি ছাড়াও আমি না।

দেওঘর আসার পূর্বে কিছুদিন যাবৎ যখনই শুইয়া উঠিতাম বা কোনদিন চলাফেরা করিতে বা অন্যান্য সময়ও মুখে —'সোঽহং' শব্দটি প্রায় আস্তে আস্তে বাহির হইত। কোন সময় ইহা বড় করিয়াও উচ্চারণ হইত। যাহারা কাছে থাকিত, তাহারা জিজ্ঞাসা করিত — কি বলিতেছ? কিন্তু কোনও উত্তর আসিত না। কেহ কেহ ভাবিত আমি 'শিবোঽহং' বোধ হয় বলি। পরে কাহারো মুখে শিবোঽহং শুনিয়াছি, কিন্তু সোঽহং আমি শুনি নাই। এইরূপ একটি শব্দ আছে, তাহাও বাহিরে কাহারও নিকট শুনি নাই। পরে ভিতরেই মীমাংসা হইয়াছিল যে সোঽহং অর্থাৎ এক সত্বাতে স্থিত অর্থাৎ একমাত্র আমিই। সে সময়ে নড়াচড়ার ভাবটি প্রায় ছিল না। অচল অটল ভাবে পড়িয়া থাকিবার ভাবটিই প্রধান। দিন রাত একভাবে কাটিয়া যাইত। যখন উঠিতাম, তখনো সেইভাব। বসিলে দেখিতাম মাটির একটি ভরা কলসী, চারিদিকে ঠেকা দিয়া বসাইলে যেমন স্থির একভাবেই বসিয়া থাকে এ শরীরটাও যেন ঠিক সে ধরণে বসিয়া আছে। চলাফেরায়ও এ ভাবটা সর্বক্ষণ। দাঁড়াইলে কোন কোন সময় পলকশূন্য অবস্থায় একভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকা হইত, শরীর অচল অটল। দেওঘরে এ শরীরের ভাবাদি এই রকমই ছিল। মহারাজজী এ শরীরের উপরোক্ত আলাপাদিতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কাহাকে ডাকিয়া লিচু আনাইয়া নিজ হাতে এ শরীরকে খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রাণগোপালবাবুর বাসায় আমরা ছিলাম, সেখান হইতে আশ্রমে সকাল বিকাল যাওয়া হইত। ওখানে গেলেও প্রায় শুইয়া পড়িতাম।

একদিন কীর্তন আরম্ভ হইলে এ শরীর কেমন হইয়া গেল। বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজজী আমার নিকটে আসিলেন। এ শরীরের হাত কেমন একটা ভাবে যাইয়া তাঁহার মাথায় পড়িল। তখন

মহারাজজী এ শরীরকে তাঁহার ধ্যান মন্দিরে নিয়া যান, আর অন্যান্য সকলকে বাহিরে থাকিতে বলেন। খুব আদরের সহিত তাঁহার ধ্যানের স্থান দেখাইলেন। নিজের আরও আরও কথা ও ক্রিয়াদির কথা খুব আনন্দের সহিত বলিলেন। সেখান হইতে কিছু দূরে তপোবন নামে একটি জায়গা আছে। ইহা নির্জন ও একান্ত। এই শরীরটা তাহাকে আবদার করিয়া বলিল — তুমি সেখানে যাইয়া থাক না বাবা।

প্রমথবাবুর বাড়ীতে মা

দেওঘর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় প্রমথবাবুর বাড়ী উঠিলাম। একদিন সন্ধ্যায় অন্যত্র যাওয়ার ঠিক হইলে, প্রমথবাবু বলিলেন — কিছুতেই হইবে না। ইহা বলিতে বলিতে সে ছাদের উপর জপে বসিয়া গেল। ক্রমশঃ এমন স্থির হইল যে যেন সংজ্ঞা লোপ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, প্রমথবাবু এইভাবে বৃষ্টিতেই বসিয়া আছে। এ শরীর উপস্থিত সকলকে বলিল — তোমরা কীর্তন আরম্ভ কর। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া সকলে কীর্তন করিল ও প্রমথবাবু ভাবাবস্থায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ঘণ্টা খানেক পর প্রমথবাবু প্রকৃতিস্থ হইল এবং বলিল — 'মা কেমন করিয়া যাইতে পারেন' এ ভাবটির আত্যন্তিকতায় কোথায় গিয়া কি আনন্দে যে ছিলাম বুঝাইতে পারি না।

হীরালালের ফাঁড়া

একদিন হীরালাল নামে একটি ছেলে আসিয়া কথা প্রসঙ্গে জানাইল যে জ্যোতিষী বলিয়াছে তাহার ফাঁড়া আছে। তখন হঠাৎ এ শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইল — তোমার ত নিকটেই ফাঁড়া। সে বলিল — তবে আমি কি করিব? এ শরীর বলিল — তুমি মাঝে মাঝে এখানে আসিও। কয়েকদিন ধরিয়া সে আসা যাওয়া করে। একদিন অমাবস্যায় সে আসিয়াছে এ শরীর হঠাৎ খুকুনীকে বলিল — একটু আগুন আন্। আগুন আনিলে আমার হাতে দিতে বলিলাম। সে 'না' বলিয়া আগুন সরাইয়া নিল। তখন হীরালালকে

একটি দেশলাই জ্বালিতে বলিলাম। সে জ্বালাইয়া আমার হাতে দিল এবং উহা যতক্ষণ জ্বলিয়াছিল ততক্ষণ হাতের একটি আঙ্গুল সে আগুনে ধরিয়া রাখিলাম। হীরালাল ব্যস্ত হইয়া বলিল — মা! এ কি করিতেছেন? বলিলাম — তোমার ফাঁড়া কাটিল। সে পোড়া ঘা শুকাইতে প্রায় একমাস লাগিল।

ইহার মধ্যে আরো এক কথা আছে। একটি লোকের ভয়ানক অসুখ, শেষ সময় এ শরীরকে নিয়া গিয়াছিল। তাহার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পূর্বেই খুকুনীকে আগুন আনিতে বলিয়াছিলাম এইজন্য যে মৃতের সৎকার হওয়ার পূর্বেই আগুন স্পর্শ করিতেই হইবে। একই ত। খুকুনী আগুন আনিয়া পিতার কথায় ফিরাইয়া নিবার পর হীরালাল আসিল। তাহার দ্বারা শরীরে আগুন স্পর্শ করান হইল। ইহাতে হীরালালেরও ফাঁড়া কাটিল, পূর্বোক্ত কথাও রহিল।

মা'র আদেশ না পালনে বিপত্তি

কথা প্রসঙ্গে মা বলিতে লাগিলেন — একদিন সন্ধ্যার সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল — মা! আমি গাড়ী আনিয়াছি, আমার বাড়ীতে যাইতেই হইবে। এ শরীর নাচঘরে হাঁটিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই খেয়াল হইল যে আমি দূরে সরিয়া থাকি, তাহার সহিত যেন কথা না হয়। সে বার বার যাইবার কথা বলে, আর এ শরীর চুপ হইয়া যায়। একবার মুখ দিয়া বাহির হয় — 'না'। সে বেগতিক দেখিয়া ভোলানাথকে যাইয়া ধরিল। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল — কেন নিতে চাও বল ত দেখি। তখন সে বলিল যে তাহার বড় ছেলের অসুখ। ডাক্তারেরা বলিয়াছে রোগ ভাল নয়। তাই মাকে নিয়া একবার দেখাইব। এই ভরসায় আসিয়াছি। ভোলানাথ আসিয়া সব জানাইলে এ শরীর বলিয়া উঠিল — সে ভাল হইবে না। ভোলানাথ চুপ হইয়া গেল এবং বলিল — এই কথা তাহাকে কি করিয়া বলি? এখন কি করা যায়। সে ত না নিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। সে সময় জ্যোতিষও নিকটে ছিল। সেও বলিল এখন কি উপায়? এ শরীর বলিল — আচ্ছা তবে চল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও খেয়ালে আসিল যে ছেলেটির মৃত্যুর পূর্বে এ শরীরের সঙ্গে দেখা নির্দিষ্ট আছে ও এ শরীরের স্পর্শে তাহার আগ্রহ রহিয়াছে। যেখানে

মৃত্যু, সেখানেও ত এক আমিই আছি। জন্ম মৃত্যুর কোন প্রশ্ন ত এখানে নাই। জন্ম মৃত্যু কি ? কাপড় বদলান মাত্র, আবার ইহাও মনে করিতে পার অন্য ঘরে যাওয়া মাত্র। মানুষের অজ্ঞান পর্দায় ইহা বুঝিতে দেয় না। সে ভাল হইবে না বলিয়া কেন যাইব না।

এ শরীর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। ভাল হইবে না শুনিতে পাইয়া ভোলানাথ আর যাইতে চাহে না। পরে তাহারা কি বলিবে, যাওয়া ঠিক কিনা ইত্যাদি জ্যোতিষের সঙ্গে আলোচনা করিতেছে। জ্যোতিষ বলিল — মা যখন যাইবেন বলিয়াছেন, তখন তিনি যাইবেনই। পরে ভোলানাথ ও আমি গাড়ীতে উঠিলাম। কোথা হইতে ২/৩টি কুকুর আসিয়া গাড়ীর সামনে ঘেউ ঘেউ করে। ঘোড়া আর চলে না। যাই হোক, আমরা গিয়া দেখিয়া আসিলাম।

ক্রমে ক্রমে ব্যারাম বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার মা একদিন গাড়ী নিয়া আসিয়া বলে — ছেলের অবস্থা খুব খারাপ, তোমাকে দেখিতে চায়। তোমাকে যাইতেই হইবে। এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি ও ভোলানাথ গেলাম। দুয়ারে পা দিতেই কেহ আসিয়া নমস্কার করিল। তখন কেহ নমস্কার করিলে এ শরীরে ভাব বদলাইয়া যাইত। ফিরিয়া এ শরীর নমস্কার করিত। দরজায় এ অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম ও পরে উঠিয়া ছেলের কাছে গেলাম। তাহার মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল — তোমাকে যাইতে দিব না। তুমি একটা কিছু বলিয়া যাও, আমরা নিশ্চয়ই তাহা পালন করিব। আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তোমাকে বলিতেই হইবে — ইত্যাদি। ভোলানাথও জোর দিতে লাগিল। তখন মুখ হইতে বাহির হইল — এ শরীর যাহা বলে তোমরা করিবে ? পারিবে ত ? আচ্ছা, দেখ আজ হইতে ১৮ দিন পর্যন্ত তাহাকে এ বিছানা হইতে উঠিতে দিও না। ইহা তুমি মনে করিয়া রাখিতে পারিবে ত ? সে খুব শান্ত চিত্তে একথা মাথা পাতিয়া নিল। আসার সময় ছেলেটি খুব কাঁদিল ও বলিল — মা ! শরীরের কষ্ট আর সহ্য হয় না। আমি মরি আর বাঁচি — শান্তি চাই।

পরে শুনিলাম ছেলেটির অসুখ একটু একটু করিয়া কমিতেছে। প্রায়ই আমাদিগকে খবর দেয়। ইহার মধ্যে একদিন আসিয়া বলে — মা ! আস্তে আস্তে বেশ ভাল হইতেছিল আবার কেন খারাপ দেখিতেছি। এ শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল — সোমবার

দিন নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে। ১৮ দিনের দিন প্রাতে ছেলেটি মারা গেল। সে বলে যে আমার ছেলে মরিতে পারে না। আমি মায়ের আদেশ পালন করিয়াছি। তোমরা তাহাকে শ্মশানে নিও না, এইসব বলিতে বলিতে সে সাহবাগে পাগলের মত ছুটিয়া আসিল। এই শরীরের শেষ রাত্রি ৪টা হইতেই কেবলই অবসন্ন ভাব। উঠিতেই চায় না। সে আসিয়া কত কান্নাকাটি করিতেছে। ভোলানাথ আমাকে জাগাইবার কত চেষ্টা করিতেছে, — কিন্তু কোন সাড়া পাইল না। পরে তাহার বাসা হইতে লোক আসিয়া বলিল — মৃতদেহ নিয়া আর কতক্ষণ থাকা যায়, সৎকার আবশ্যক ও তাহাকে জোর করিয়া লইয়া গেল। ইহার পর শোকে দুঃখে সে একেবারে অস্থির হইয়া গেল। সকলকে বলিত — মা'র কথা ঠিক নয়। তোমরা মা'র কাছে কেহ যাইও না।

২/১ মাস চলিয়া গেল। সে একদিন আসিয়া বলে মা আমাকে ক্ষমা কর। তোমার কথা বাস্তবিক রক্ষা হয় নাই, তাহাতেই আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আমি ১৮ দিনের মধ্যে এক সোমবার নীচের তলায় গিয়াছিলাম। তাহার কাছে আর কেহই ছিল না। তখন উপর হইতে সে আমাকে ডাকিয়া বলে ঐ ছাদের কাঠগুলি শুকাইয়াছে এগুলি নামাইয়া ঘরে নাও। সেই ছাদটি তাহার বিছানায় বসিয়া দেখা যায় না। সে কথা শুনিয়া তাহাই করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথা হইতে যে সে কাঠ দেখিল, এ খেয়াল তখন আর মাথায় আসে নাই। এখন সে ঘটনা মনে হইয়াছে। তুমি ত মা কৃপা করিয়াছিলে, আমার দুর্ভোগ আছে কি করিব ? এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রোগ সারানোর খেয়াল

কোন সময় হাজার মাথা কুটিয়া কেহ কোন কথা বলিলে কানেও যাইত না। এ শরীরের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিত — শুনিতেছ কি না বল ? আমি দেখিতাম যে কথা শুনিয়া আমার খেয়ালে থাকিত, আমার শরীর দিয়াই হউক বা অন্য কোন রকমেই হউক তাহার ব্যবস্থা হইয়াই যাইত। ঐ সময় এ খেয়াল হইত—ইহা এ শরীরের করণীয় করিতেই হইবে। বাহিরে মোটেই ইহার প্রকাশ

হইত না। এইরূপে যে কত লোক পশুপাখী, গাছপালার সঙ্গেও খেলা হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার কোন সময় কাহারও উপর কোন রোগপীড়া ইত্যাদি না নিয়াও রোগাদি সারান হইত।

বাজিতপুর থাকিবার সময় গাছের ডগা, তরকারি, ফলাদি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে মানুষের সঙ্গে কথা বলিবার মত কথা বলিতাম — চল, এখন তোমার এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে। তাহারা যেন জীবন্ত, এইরূপ ব্যবহার হইত। কোন লোকজন কাছে থাকিলে মুখে কিছু বাহির হইত না।

গাছপালা লাগাইলে, তাহাদের এমনভাবে যত্ন করিতাম, যেন মানুষের সেবা করিতেছি। দেখিতাম সবজি ইত্যাদি যখন যাহা করিতাম, খুব সুন্দর হইত। খেয়াল হইত — আমিই সৃষ্টি করিতেছি, আমিই স্থিতি করিতেছি, আমিই সব করিতেছি। এক আমাতেই আমি।

ঢাকায় প্রথম প্রথম যখন জাগতিক ও পারমার্থিক বিষয়াদি নিয়া লোকজন আসিত, তখন জবাব দিবার হইলে আপনা হইতেই বাহির হইয়া যাইত। নতুবা তাহাদের চেষ্টায় কিছুই হইত না। এমনও হইত যে মুখ হইতে বাহির হইবে বা কিছু করিতে যাইব, অমনিই কোন একটি অন্তরায়রূপ বিঘ্ন আসিয়া জুটিয়াছে।

ঐ সময় সূক্ষ্মতঃ অনেক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। যাহাকে দেখি নাই তাহার অসুখ, অশান্তি কাহারও মুখে জানিয়া খেয়ালে রহিয়াছে এবং সে সুস্থ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন সময়ে আবার রোগীর রোগমুক্তি — কাহাকেও ভোগ করাইয়া বা নিজে ভোগ করিয়া বা খেয়াল হইলেই রোগী রোগমুক্ত হইয়া যাইত। খেয়াল হউক বা না হউক কেহ বলিয়া গেলেও রোগমুক্ত হইয়া যাইত। কোন সময় আবার, কেহ জানায় নাই, বলে নাই, আবার জাগতিকভাবে কাহারও সহিত চেনা জানা নাই, রোগমুক্ত, বিপদমুক্তির কারণ এই শরীরটা হইয়া দাঁড়াইত। যে কোন উপলক্ষ্য এই শরীরটা নিজেই সৃষ্টি করিয়া লইত। অথচ এমন ঘটনা হইয়া গিয়াছে, যাহারা রোগমুক্ত হইয়াছে, তাহারা হয়ত এই শরীরকে জাগতিক হিসাবে জানেই না। ভোলানাথ কাহারও কথা শুনিলে বলিত — আমি উহাদের বলি? এ শরীরের উহাদের জানাইবার ভাবটি, তখন আসিত না। তাই নিষেধ করা হইত। আপনা হইতেই হইয়া যাইত। আমি, আমার

স্থানে বসিয়া, তাহাকে তাহার ঘরে গিয়া যেন স্পর্শ করিতেছি বা দেখিতেছি, এইরূপ খেয়াল হইত।

সাধকের যখন সব এক, একেরই বিভিন্ন মূর্তি এইরূপ ভাব জাগ্রত হয়, তখন আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক বা অসুখের কথা, তাহার নিকট একই রূপে প্রতিভাত হয়। কর্মও যে তাঁহারই একরূপ ইহা তাহার বোধ হয়। এ অবস্থায় সে যদি হুঁসিয়ার থাকিয়া পরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিতে পারে, তাহার পতন হইবার আশঙ্কা। নানা রকমারি নিয়া শরীরটা খেলিয়াছে ত।

সাহবাগে যখন ছিলাম তখন একদিন সন্ধ্যায় শশাঙ্কবাবুর গাড়ীতে বাহিরে যাইতেছি। রাস্তায় কি এক খেয়াল হইল জ্যোতিষের বাসায় যাইব। সে তখন সাহবাগের নিকট পীড়িত অবস্থায় এক বাড়ীতে আছে। প্রাতেও সেখানে গিয়াছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার ঘরে বেগে প্রবেশ করিলাম। ভোলানাথ ও শশাঙ্কবাবু পিছনে পিছনে আসিল। আমার বসার বা কথা বলিবার কোন ভাব নাই। কেমন এক অস্বাভাবিক শরীরের গতিতে যাইয়া সে ঘরের কোণাতে একটি টেবিলে কতকগুলি চাঁপা ও গোলাপফুল ছিল তাহাতে হাত দিয়া দুটি ফুল নিলাম এবং সামান্য একটু দাঁড়াইয়া আবার বাহির হইয়া আসিলাম। সেখান হইতে ধানকোড়ার ৺দীনেশবাবুর বাড়ী গেলাম। সেখানে পৌঁছিলেই পানুবাবুর স্ত্রী নমস্কার করিতে আসিল, তাহার হাতে একটি ফুল দিলাম। আর একটি হাতে রাখিলাম।

কীর্তনাদির পর বনমালী বাক্‌চির বাসায় এ শরীরকে লইয়া গেল। সেই বাড়ীতে তাহার স্ত্রীর খুব অসুখ ছিল। সকলের অজ্ঞাতে ঐ ফুলটি রোগীর বিছানায় রাখিয়া দিলাম। পরে শুনিলাম সে ভাল হইয়া গিয়াছে। যেইদিন ইহা করা হইয়াছিল সেইদিন রোগিণী অতি কষ্টে উঠিয়া এই শরীরের খাওয়ার জন্য কিছু রান্না করিয়াছিল।

মনুর সর্পাঘাতযোগ

কুঞ্জবাবু তাহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সহ ছোট মেয়ের বিবাহ দিতে ঢাকা আসে। বেনারস ফিরিবার সময় কুঞ্জবাবুর স্ত্রী বলে দেখ মা

— আমার ছেলে মনুর সর্পাঘাতে বা দণ্ডাঘাতে মৃত্যু বলিয়া কুণ্টিতে আছে। এই ফাঁড়া নিকটবর্তী। আমি তাহাকে তোমার কাছে রাখিয়া যাইব। এ শরীর বলিল — তুমি তাহাকে নিয়া যাও। অনেক পীড়াপীড়ি করিল। পরে 'না' বলাতে লইয়া গেল।

কিছুদিন পর এ শরীরের খেয়াল হইল এখানে উপস্থিত কাহাকেও না জানাইয়া কিছুদূর ঘুরিতে যাইব। একদিন সন্ধ্যায় জ্যোতিষের বাসায় গেলাম। সে শয্যাশায়ী, বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। ভোলানাথকে দেখাইয়া তাহাকে বার বার বলিতে লাগিলাম — নমস্কার কর, নমস্কার কর। সে অতিকষ্টে উঠিয়া নমস্কার করিল। সাহবাগ হইতে প্রত্যহ তাহার জন্য প্রসাদ পাঠান হইত। সেইদিন কতকগুলি কিসমিস্ হাতে ছুঁইয়া তাহাকে দিলাম, বলিলাম ইহা হইতে তুমি প্রতিদিন নিও। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, কেহই ঠিক বুঝিল না কি জন্য এইসব হইতেছে। এ শরীরের এইসব খেয়ালী ভাব সকলেই জানিত। কিন্তু জ্যোতিষ চুপ হইয়া মুখখানি মলিন করিয়া আদ্যোপান্ত লক্ষ্য করিয়াছিল। কিছু বলিল না।

সেখান হইতে শশাঙ্কবাবুর ও বাউলের বাড়ী হইয়া সাহবাগে আসা হইল। রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় শশাঙ্কবাবু আসিয়া উপস্থিত ও বলিল — কি জানি কেন, আমাদের প্রাণ কাঁপিতেছে। আমরা না মাকে হারাই। আসিবার সময় সাহবাগের গেট বন্ধ বলিয়া দেওয়াতে পার হইয়া আসিতে এই পায়ে ময়লা লাগিয়াছে, তাই ঘরের ভিতরে আসিতে পারি না, তাহা না হইলে আজ এখানেই পড়িয়া থাকিতাম। এখন বাসায় যাইয়া স্নান করিতে হইবে। আমাকে এই রকম করিয়া এত রাত্রে সরাইয়া দেওয়া ইহাও বোধ হয় মায়ের ইচ্ছা। বাস্তবিক কি তোমরা কোথাও যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ? এ শরীর বলিল — গেলে ত তোমরা জানিতেই পারিবে। তখন সে আবার বলিল — তোমরা চলিয়া গেলে জানিব ত? বলিলাম — জানিবে। সে বাসায় চলিয়া গেল। আমরা শুইয়া পড়িলাম।

উঠিয়া দেখি বেশ ফর্‌সা হইয়াছে। ভোলানাথ বলিল — এখন বাহির হইলে সকলেই দেখিবে। বলিলাম — চল ত বাহির হই। যদি কেহ রাস্তায় দেখে, যাইব না। এই বলিয়া উভয়ে বাহির হইতেই দেখি কমলাকান্ত ঘরের দরজার সামনে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। গেটের দারওয়ানও দরজা খুলিয়া দিয়া কোথায় গিয়াছে। জ্যোতিষ

প্রায়ই ভোরে উঠিয়া তাহার ঘরের বারান্দায় বসিত, সেখান হইতে বড় রাস্তার লোক চলাচল দেখা যায়। সেইদিন দেখিলাম তাহার বাড়ীরও কাহারো সাড়া শব্দ নাই। ঘরের দরজা বন্ধ। আমরা স্টেশনে গেলাম। দেখি গাড়ী তৈয়ার। নিশিবাবুর ছেলে নারায়ণগঞ্জ যাইতেছিল, সে টিকিট আনিয়া দিল। নারায়ণগঞ্জ গেলাম। সেখান হইতে কয়েকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া কলিকাতা গেলাম। জ্যোতিষ ইতিমধ্যে সপরিবারে হাওয়া পরিবর্তনে যাইবে বলিয়া কলিকাতা গিয়াছে। আমাদের সঙ্গে দেখা হইলে এইরূপ না জানাইয়া আসিয়াছি বলিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিল। বলিল — আপনারা চলিয়া আসাতে ঢাকা আর ভাল লাগে না, তাই চলিয়া আসিয়াছি। তাহারা বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেল। আমরা পরে দেওঘর গেলাম। বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে দেখা হইল, তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তথা হইতে বিন্ধ্যাচল যাইব ঠিক হইল। বেনারসে এ খবর পাইয়া কুঞ্জবাবুর স্ত্রী তাহার দুইটি ছোট ছোট ছেলে ও দুইটি মেয়ে লইয়া মোগলসরাইতে আমাদের গাড়ীতে উঠিল।

আমরা বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের উপর বাংলোয় উঠিলাম। জ্যোতিষ নীচে ছিল। পাহাড়ের উপরে উঠিবার পূর্বে তাহাকে দেখিয়া গেলাম। বিন্ধ্যাচলে অষ্টভূজা প্রভৃতি দেবতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাকে দেখাইবে বলিয়া ছেলেমেয়েদের আকাঙ্খা। একদিন প্রাতে সকলে বাসা হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় আমাদের পিছনে আরও একদল জুটিল। অষ্টভূজা দেখিলাম। সঙ্গীরা বলিল ঐখানে একটি কুণ্ড আছে তাহাকে সীতাকুণ্ড বলে। সে রাস্তা হইয়া কালীখো যাইব। আমি খুব জোরে যাইতেছি, পথের লতার ভিতর দিয়া সরু রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছি। ইহার মধ্যে দেখি কি — পায়ের তলায় কি রকম বোধ হইতেছে। ৪/৫ হাত দূরে যাইয়া পিছনে ফিরিয়া দেখি, পাথরের উপর একটি সাপ ফণা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। ইহার মধ্যে আমি সকলকে ডাকিয়া বলিলাম তোমরা এখন আসিও না। দাঁড়াও। ভোলানাথ বলিল কি হইয়াছে? দেখিল একটি সাপ। জিজ্ঞাসা করিল — কামড়াইয়াছে নাকি? তাঁহার হাতে লাঠি ছিল। মারিতে উদ্যত হওয়াতে না করিলাম। কিছুক্ষণ সাপটি আমার দিকে তাকাইল, আমিও তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া-

ছিলাম। পরে স্যাপটি ভোলানাথের দিকে ফিরিয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল। সাপটির ভাব ও দৃষ্টি দেখিয়া সকলে অবাক হইল।

আমরা রাস্তা দিয়া চলিয়াছি, কুঞ্জবাবুর ছোট ছেলের তখন বয়স ৬/৭ বছর ছিল। তাহার মাকে দৌড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল — দাদার যে সাপে কাটার ফাঁড়া ছিল, তাহা আজ মা কাটাইয়া দিলেন। তখন তাহার মা'রও খেয়াল হইল। হিসাব করিয়া দেখিল, কোষ্ঠীতে এই সময়ে তাহার বিপদ লিখা আছে।

আমরা বেশ চলিয়াছি। ভোলানাথ মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে পায়ে সাপে কামড়াইয়াছে নাকি। আমি হাসি আর হাঁটি। ইতি-মধ্যে পা উঠাইয়া একবার দেখিলাম। যে পাটি সাপের গায়ে পড়িয়াছিল, সেই পাটি উরু পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিতেছে। তখন আবার চলিতে লাগিলাম। কাহাকেও এ শরীরের বিষয় বলার ভাব হইল না। সেখান হইতে বাসায় গিয়া বলিলাম — আজ ভাত খাইব। তোমরা রান্না কর। আমরা সেখান হইতে পাহাড়ের নীচে জ্যোতিষের বাসায় গেলাম। ভোলানাথ তাহাকে বলিল — দেখ! তোমার মা সাপের গায়ে পা দিয়াছে। কামড়াইয়াছে কিনা জানি না। সে তাড়াতাড়ি কিছু স্পিরিট আনিয়া আমার পায়ের তলায় দিল। যে পায়ে সাপ কাটিয়াছিল, ভাবের খেয়ালে অন্য পায়ে ঢালিয়া দিল। তখন এ শরীর হাসিতেছে ও বলিতেছে — এইসব দিও না। কিছু দরকার নাই। পরে পাহাড়ের উপর আসিয়া ভাত খাইতে বসিলাম। সে সময় এ শরীর দু বেলা সামান্য ফলাদি খাইত, অনেক দিনের পর ভাত খাইতেছে। ভোলানাথ খাওয়াইয়া দিতেছে। দেখা গেল, হাঁড়ির ডাল, ভাত, তরকারি শেষ হইয়াছে। এ শরীর আর আরো খাইব, আরো খাইব করিতেছে, আর বলিতেছে — আমারে খাইল সাপ, আর আমি খাই ভাত। তাড়াতাড়ি আবার খিচুড়ি রান্না করিল এবং আমাকে খাওয়াইল। শেষে তাহাদের বলিলাম — দেখ, তোমরা খাইয়া যাহা বাঁচিবে, পরে আবার খাইব। ভোলানাথের খাওয়া হইল, এ শরীর আবার খাইল। পরে পুনরায় রান্না করিয়া বাড়ীর সকলে খাইল।

বিকালে পাহাড়ের নীচে আসিয়া এক জায়গায় বসিয়াছি, তখন ছেলেরা আসিয়া পায়ের নীচে দুটি নীল বড় সুচ ফোটানর মত দাগ দেখিতে পাইল ও বলিল এই ত তোমার পায়ে সাপে কাটার দাগ।

এক বস্ত্রে ভ্রমণ

জ্যোতিষকে চুনার যাইতে বলিলাম। কুঞ্জবাবুর পরিবার বেনারস চলিয়া গেলে, আমরাও চুনার গেলাম। তখন কি এক খেয়াল হইয়াছিল জ্যোতিষের বাসার কোন জিনিষ খাইব না। সেইজন্য তাহার খেয়ালে খাইলেও কতকটা টাকা তাহাকে দেওয়া হইত। সেও না করিত না। কিছুদিন চুনারে থাকিয়া, কোন স্থানের কথা তাহাদিগকে না বলিয়া আমরা ভরতপুর জয়পুরের দিকে গেলাম। এ শরীরের ভাব হইয়াছিল যে কোথাও একেবারে একান্তে একবস্ত্রে যাইয়া থাকিলে মন্দ কি। টাকা পয়সা কিছুই সঙ্গে রাখিবে না। জগৎ ভরাই ত আপনার জন। সঙ্গে টাকা জিনিষ পত্রের দরকার কি? রাস্তায় বাহির হইলে দেখি ভোলানাথ নানা রকমে কষ্টবোধ করে এবং বলে মেয়ে মানুষ নিয়া একা এইভাবে আসা যাওয়া বড় কষ্টকর। তাহার খাওয়া দাওয়া এবং থাকারও অসুবিধা হয়। ইহা দেখিয়া বলিলাম — না, উপস্থিত একা চলা হইবে না। চল কলিকাতায়।

আমরা ফিরিবার সময় চুনার আসিলাম, জ্যোতিষের স্ত্রী ও মেয়ের সহিত কয়েকদিন আনন্দে কাটিল। জ্যোতিষের স্ত্রীর ভাবগুলি খুবই সরল, সোজা ও সুন্দর দেখিতাম। জ্যোতিষকে হাসিয়া হাসিয়া বলিতাম — তোমার চেয়েও মায়ের ভাব আমার নিকট বেশী সরল দেখায়। সে বলিত — আপনারও তাহাকে ভাল লাগে, সে ত দেখি আপনার দর্শনে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না।

ইহার মধ্যে ভোলানাথ একদিন দেখিল, আমি বসিয়া বসিয়া খুব মাথা চুলকাইতেছি এবং বলিল — দেখ না মাথায় কতকগুলি উকুন। তখন হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলাম — ইহারা ত আপনা হইতে আসিয়া বাস করিতেছে। এখন কোথায় তাড়াইয়া দিব। আচ্ছা, তোমার ইচ্ছাই পূরণ করি। জ্যোতিষের স্ত্রীকে যাইয়া বলিলাম — দেখ আমার মাথায় উকুন বাস করিতেছে। তখন মাথার চুল লম্বা ও বেশী ছিল। সে মাথা বেশ ভাল করিয়া ধোয়াইয়া ও আঁচড়াইয়া দিল। সেই দিন হইতে উকুন চলিয়া গেল। পরে আমরা কলিকাতায় আসিলাম।